OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 61 - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘ব্যভিচারিণী’ : ত্রিকোণ প্রেমের নবভাষ্য

সুশান্ত রুহিদাস
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: sushantaruhidas@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, মনোবিকলন তত্ত্ব, ‘ব্যভিচারিণী’ গল্প, প্রেমের পরিণতি।

Abstract

মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্ক বহু কালের পুরোনো। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বিচিত্র ধরনের গল্প। প্রসঙ্গক্রমে ফরাসি সাহিত্যিক অনরে দ্য বালজাকের (১৭৯৯-১৮৫০) ‘A Passion In The Desert’ গল্পে দেখি মানুষের সঙ্গে এক পশুর অকৃত্রিম ভালোবাসা গড়ে উঠতে। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পে বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঘিনী’ গল্পেও দেখা যায় মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সেই বিচিত্র সম্পর্ককে।

বর্তমান কালের অন্যতম সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ব্যভিচারিণী’ গল্পেও এক জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র লখীন্দরকে প্রতারিত করে তার স্ত্রী গোলাপী। স্ত্রীহীন জীবনে লখীন্দরের একমাত্র সঙ্গী হয়ে ওঠে এক স্ত্রী পদ্মগোখরো। তার বেশিরভাগ সময় কাটে এই পদ্মগোখরোকে নিয়ে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এক বিচিত্র সম্পর্কও গড়ে উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লখীন্দর এই পদ্মগোখরোর কাছেও পায় কেবলই বঞ্চনা। এমত সংকট ও টানাপোড়নে লখীন্দর ভেঙে পড়লেও সে হয়ে উঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ। সেই প্রতিহিংসা যে কতটা ভয়ানক ও নিষ্ঠুর হতে পারে গল্পের শেষে তা আমরা জানতে পারি।

Discussion

বর্তমান সময়ের বাংলা ছোটগল্পের এক অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। তবে ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠেছে সত্তর দশক থেকেই। অর্ঘকুসুম দত্তগুপ্ত সম্পাদিত ‘সমতট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প। গল্পের নাম — ‘হরিণের মাংস’। উল্লেখ্য, এই গল্পটি সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই রকমই প্রান্তিক মানুষদের গল্পকথা নিয়ে তপন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যভিচারিণী' গল্পটির জন্ম। তবে এই গল্পটিতে মানুষের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়ার থেকেও সবচেয়ে বড় তথা প্রধান হয়ে উঠেছে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর এক বিচিত্র সম্পর্ক — যে সম্পর্কের মূলে আছে প্রেম অথবা ঈর্ষা।

মানুষের জীবনে কতরকমের ওঠাপড়া। হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধির নিরন্তর বিরোধ চলতেই থাকে। তাই মনের গহীন গভীর অন্ধকারে নানা চোরা স্রোত বইতে থাকে। সেই স্রোতে আসে আনন্দ, আসে বেদনা, আসে প্রেম অথবা বিচ্ছেদ। আলোচ্য গল্পটিতে মানুষের সেই চোরা স্রোতের একটি দিক উন্মোচন করেছেন সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্প পাঠে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর এক বিচিত্র সম্পর্ককে। এ প্রসঙ্গে ঝর্না বর্মণের কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই—

> "মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর বা না-মানুষের প্রাণীর সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। মনুষ্যেতর প্রাণীর সুদীর্ঘকালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তাই বুদ্ধির গৌরবে মনুষ্যেতর প্রাণীকে ব্যবহার করেছে নানাভাবে। কখনো গৃহপালিত পশু হিসেবে তারা মানুষকে সুরক্ষা দিয়েছে, কাজে সাহায্য করেছে, আবার কখনো তারা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কখনো এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দখলের অধিকার নিয়ে।"[১]

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় আমরা দেখে আসছি বিশেষ করে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় নীতিবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কথাশিল্পীর রচনায় আদর্শবাদের প্রবাহ। অবশ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তীকাল থেকে সেই ভাবধারায় ক্রমশ পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। সেই আদর্শবাদকে অতিক্রম করে, প্রচলিত ভাবধারা থেকে সরে এসে এক নতুন মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল 'কল্লোল যুগ'। মূলত ১৯২৩ সাল থেকে কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ কবি সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্র-বিরোধিতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের 'মনোবিকলন বা মনঃসমীক্ষণ' তত্ত্ব। তাঁর এই তত্ত্বের উপর লেখা দুটি আকর গ্রন্থ হল- 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং 'The Psychopathology of Everyday Life' (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ) - যা ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে James Strachey জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে মানব মনের জটিল ও গোপনতম স্তরগুলি ক্রমশ প্রকাশ্যে আসে। তাঁর মতে মানবমনে তিনটি স্তর রয়েছে—

১. চেতন স্তর (Conscious Mind)
২. অবচেতন (Pre-conscious Mind)
৩. অচেতন (Unconscious Mind)

এছাড়া ব্যক্তিত্বের উপাদানের দিক থেকে মানবমন তিনটি উপাদানে গঠিত — ১. Id (ইদ), ২. Ego (অহম্) এবং ৩. Super Ego (অধিসত্তা)। তাঁর এই মনোবিকলন তত্ত্বের ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানসিক রোগগ্রস্থ লোকের মনের বিশ্লেষণ যেমন হয়েছে ঠিক সেভাবেই একজন স্বাভাবিক মানুষের মনের জটিলতম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ্যে এসেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের চেতন মনের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করে অবচেতন মন ও শৈশবের অভিজ্ঞতা। এই অবচেতন স্তরই হল মানব মনের নিয়ন্ত্রক। তবে এই স্তরটি খুবই বিশৃঙ্খল। সর্বোপরি ফ্রয়েড আমাদেরকে এমন এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন যার মূলকথা হল–

> "Sex is the main spring of our unconscious life."[২]

ফ্রয়েডের এই সত্যের প্রকাশে মানব মানবীর প্রেমের আদর্শবাদে অচিরেই ফাটল ধরল। ফ্রয়েড আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে শরীরকে উপেক্ষা করে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়না অর্থাৎ দেহকে বাদ দিয়ে প্রেমের জন্ম হয় না। দেহসর্বস্ব প্রেমের স্বরূপ উন্মোচনের ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ল দেহবাদী প্রেমের বাস্তব বিশ্লেষণ। যার ফলে বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ পালাবদল ঘটতে দেখা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যভিচারিণী' গল্পের পূর্বে নানান সাহিত্যিকের রচনায় মানুষের সঙ্গে প্রাণীর আন্তঃসম্পর্কের কথা আমরা পেয়েছি। যেমন- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি গল্প এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলিতে আমরা দেখেছি, উক্ত লেখকদের মধ্যে প্রথমজন তাঁর গল্পে প্রাণীর মধ্যে মানবিক দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন, দ্বিতীয়জন তাঁর গল্পে একটি গৃহপালিত পশুর করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের বাস্তব রূপটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়জন তাঁর গল্পে পশু ও মানুষের নিঃস্বার্থ প্রেম, সম্ভাব্য বিচ্ছেদ এবং শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি দেখিয়েছেন। তবে এ সমস্ত গল্পে সাধারণ জীবনযাপনকে ছাড়িয়ে কোনো জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি, এমনকি প্রকাশিত হয়নি মানুষের কামনা-বাসনাও।

প্রসঙ্গক্রমে ফরাসি সাহিত্যিক অনরে দ্য বালজাকের (১৭৯৯-১৮৫০) 'A Passion In The Desert' গল্পটি আমার স্মরণে আসে। এই গল্পে কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া এক সৈনিকের সঙ্গে একটি স্ত্রী চিতাবাঘের বিচিত্র এক সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখি। দুর্গম মরুভুমিতে ভীত, সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্থ সৈনিকটি আত্মহননের পরিবর্তে বেছে নিয়েছে এক দিনের সময়। নিজের অজান্তেই সৈনিকটি আশ্রয় নিয়েছে একটি চিতার আবাসস্থলে, একটি গুহায়। সৈনিকটি আত্মহননের ভাবনা থেকে সরে আসেন, বেঁচে থাকার পথ বেছে নেন। ঘটনাক্রমে আমরা দেখতে পাই এভাবেই মানুষ ও পশুর পরস্পরের অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। পশু-পাখিদের ভালোবাসলে তারাও যে সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেয় এ গল্পে আমরা যেন ঠিক তাই দেখতে পাই। কিন্তু গল্পের শেষে দেখি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সৈনিকটিই সেই স্ত্রী চিতাটিকে হত্যা করেছে। এ আসলে চার্লস ডারউইনের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' নাকি রক্ত-মাংসের মানুষের সেই প্রাগৈতিহাসিক চেতনা বড় হয়ে ওঠে— তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে চিতাটির জন্য সৈনিকটি আত্মহত্যার সংকল্প পরিহার করে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল, গল্পের শেষে দেখি তাকেই হত্যা করে বসেছেন সৈনিকটি। গল্পটিতে সৈনিক ও চিতার সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় কোনো পক্ষ ছিল না তবুও কেন তাঁকে এমনই একটি পথ শেষমেশ বেছে নিতে হল তা বুঝি না। তবে চিতাটিকে হত্যা করার পর সৈনিকটির মনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সৈনিকটি মানসিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন।

অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী' বা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যভিচারিণী' গল্পে মানুষ ও পশুর তুমুল প্রেমের মাঝে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি লক্ষ করি — যা গল্পগুলিকে মনস্তত্ত্ব-সমৃদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়েছে।

'নারী ও নাগিনী' গল্পের প্রধান চরিত্র কদাকার দেখতে খোঁড়া শেখ। খোঁড়া শেখের স্ত্রীর নাম জোবেদা। খোঁড়া শেখ একজন বেদে। কখনো সাপের খেলা দেখিয়ে তো কখনো দিনমজুরি করে সে তার সংসার চালায়। এ হেন খোঁড়া শেখ একদিন উদয় নাগের এক বাচ্চা সাপিনীকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সাপিনীর সৌন্দর্য ও তার চালচলন দেখে খোঁড়া শেখ মুগ্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই সাপিনীটি খোঁড়া শেখের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এতটাই ভালো লেগে যায় যে, সে সারাক্ষণ সাপিনীটিকে নিজের গলায় কিম্বা হাতে জড়িয়ে রাখে। আদর করে তার নাম রাখে - 'বিবি'। কখনো কখনো বিবিকে চুমুও দেয়। সর্পচরিত্রের সেই বিকৃত ও বীভৎস রূপ আমাদের সকলেরই জানা তা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের রচনার কৌশলে ও বর্ণনার পারদর্শিতায় উদয়নাগিনীটি এমন মানবসুলভ, এমনই মানবিক হয়ে ওঠে যে বিস্মিত হতে হয়।

খোঁড়া শেখের স্ত্রী জোবেদা এতটাই ভালো মানুষ যে কদাকার দেখতে স্বামীকে সে অন্ধের মতো ভালোবাসে। খোঁড়া শেখকে শিশুর মতো আগলে রাখে জোবেদা। তার ভালো মন্দের খবর রাখে। প্রকৃত অর্থেই অযোগ্য খোঁড়া শেখের সুযোগ্য স্ত্রী হল জোবেদা। একসময় উদয়নাগিনীকে নিয়ে খোঁড়া শেখের এই মাতামাতি পছন্দ হয় না জোবেদার। জোবেদার মাঝে মাঝেই ভয় হয় কোনো সাপ যদি তাঁর স্বামীকে কামড়ায় এবং এই পরিণতির কথা ভেবে তার মনটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। প্রিয়জনের সম্ভাব্য বিচ্ছেদের ছবি জোবেদার চোখে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু খোঁড়া শেখ এসবে কান দেয় না। সে তার এই নতুন 'বিবি'র জন্য একটি ছোট্ট সোনার নাকছাবি আনে। সাপিনীর নাকে তা পরিয়েও দেয়। এরপর সে এক অদ্ভুত কাজ বসে জোবেদাকে বলে ঘর থেকে আয়না ও সিন্দুরের কৌটো আনতে। জোবেদা এলে —

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হ'ল।"[৩]

সাপিনীটির প্রতি খোঁড়া শেখের এত আদিখ্যেতা জোবেদার পছন্দ হচ্ছিল না প্রথম থেকেই। তাই নতুন বিবিকে জোবেদা দু-চোখে দেখতে পারত না। কথায় কথায় বিবির মৃত্যু কামনা করত। ঘর থেকে বেরোনোর জন্য মনে মনে বারবার তাড়া দিত, অবশেষে সেইদিনটিও ঘনিয়ে আসে। সাপিনীর গা থেকে এক অদ্ভুত ধরণের গন্ধ পায় খোঁড়া শেখ। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় খোঁড়া শেখ বুঝতে পারে সাপিনীর মিলনের সময় এসেছে। তাই সবকষ্ট চাপা দিয়েও একসময় খোঁড়া শেখ সাপিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা দেখতে পাই খোঁড়া শেখের এই নতুন বিবি মাঝে মধ্যে ঘুরে ফিরে চলে আসে তারই বাড়ির আনাচে কানাচে। বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করতে দেখে জোবেদা যেভাবেই হোক বিবিকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, সেই রাত্রেই সন্তর্পণে বিবি বাড়িতে ঢোকে এবং জোবেদাকে কামড়ায়। খোঁড়া শেখ বিবিকে ঝাঁপিতে বন্দী করে বলে —

> "জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।"[৪]

গল্পে উদয়নাগিনীটি মনুষ্যসুলভ হয়ে জোবেদার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। এরা একে অপরকে সতীনের মতো আচরণ করেছে, ঈর্ষা করেছে। জোবেদা যেমন স্বামীর ওপর নিজের অধিকার কায়েম রাখতে চেয়েছে, সাপিনীও ঠিক তেমনই খোঁড়া শেখকে আপন করতে চেয়েছে। তাই জোবেদার সঙ্গে খোঁড়া শেখের আদর-ভালোবাসার সময় আবার বিবি ফিরে এসেছিল। জোবেদা ঘুঁটে ছুড়ে বিবিকে মারতে গেলে মাটিতে ছোবল মেরে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই প্রতিবাদ, হিংস্রতা সে সম্পূর্ণ জোবেদাকে দেখিয়েছে। তাই গভীর রাত্রে সে এসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জোবেদাকে দংশন করে পথের কাঁটা সরিয়েছে।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই খোঁড়া শেখ বিবাগী হয়ে যায়। ফকির হয়ে ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে সে গৃহত্যাগ করেছে। জোবেদাহীন জীবন তার ভালো লাগেনি। তাই পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর ব্রতে সামিল হয়েছে। কিন্তু এরপর ঘটনাটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে এক নতুন বাঁক নিয়েছে। সাপটির প্রতি অদ্ভুত মায়ার বশে খোঁড়া শেখ নিজের কথা রাখতে পারেনি। তাকে ছেড়ে দিয়েছিল এই বলে যে—

> "শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবেই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।"[৫]

এইরকম দার্শনিক একটি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খোঁড়া শেখ সাপটিকে ছেড়ে দেয়। খোঁড়া শেখের ভিটেকে অবলম্বন করে সাপটি তার বংশ বিস্তার করতে থাকে। উদয়নাগের ভয়ে কেউ আর খোঁড়া শেখের ভিটের পাশ দিয়ে যায় না। গল্পের শেষে গল্পকার উদয়নাগিনীকে খোঁড়া শেখের দ্বিতীয় স্ত্রী রূপে দেখিয়েছেন। তাই দেখা যায় নিজের সন্তান সন্ততি নিয়ে খোঁড়া শেখের ভিটেতে সে একটা অধিকার ফলিয়েছে। ফলে এক দার্শনিক চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে নারী এবং নাগিনী সমার্থক হয়ে উঠেছে। উভয়ের প্রবৃত্তিই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী' গল্পেও আমরা এধরনের এক আশ্চর্য সম্পর্ক দেখতে পাই। গল্পকথক তরাইয়ের জঙ্গলের ধারে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একটি বাঘিনীর সঙ্গে একটি মানুষের অদ্ভুত ভালোবাসার কথা জানতে পারেন। বাঘিনীর অত্যাচারে দিশেহারা গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে কথক সেই পাহাড়ি গ্রামে গিয়েছিলেন। কথক সেখানে পরিচিত হন গল্পের নায়ক রূপদমনের সঙ্গে।

> "সাহেব, বাঘিনীকে মারিয়া ফেলিবার প্রয়োজন আছে কি?"[৬]

— রূপদমনের এই প্রশ্নকে কথক প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু গল্পের অগ্রগতিতে আমরা জানতে পারি বাঘিনীকে শিকার করে ফিরে আসার রাত্রে রূপদমনের সঙ্গে কথকের আবার দেখা হয়। শিকার উৎসব শেষে গ্রামবাসীরা সবাই চলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গেলে কথক ঘুমিয়ে পড়েন। মৃত বাঘিনীটি পড়ে থাকে দূরে। কিন্তু মধ্যরাত্রে রূপদমনের কান্নার সুরে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। কথক ঘুম থেকে উঠে দেখেন রূপদমন বাঘিনীটিকে কোলে নিয়ে কেঁদে চলেছে। এরপরই গল্পকথক আসল কথা জানতে পারেন। জানতে পারেন বাঘিনীর সঙ্গে রূপদমনের ভালোবাসার গভীর সম্পর্কের ইতিহাস।

একদা এই পাহাড়ি যুবক রূপদমন ও তার সঙ্গী-সাথীরা কাঠ কাটতে জঙ্গলে যেত। সেখানে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে রূপদমন নিজের অজান্তেই বাঘিনীর কোটরে প্রবেশ করে। সেখানেই বাঘিনীর সঙ্গে তার ভাব ও ভাব থেকে ক্রমে ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাঘিনীর পায়ে আটকে থাকা শজারুর কাঁটা রূপদমন বের করে দিলে একে অপরের প্রতি তারা বিশ্বস্থ হয়ে উঠে। তাদের সম্পর্ক ক্রমশ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, বাঘিনী রূপদমনের জন্য পাহাড়ি ছাগল শিকার করে এনে দিত। তাছাড়া বাঘিনী শিকারের উদ্দেশ্যে কখনও আর রূপদমনের গ্রামের দিকে আসত না। তবে রূপদমনকে একদিন না দেখতে পেলে বাঘিনী গ্রামে চলে আসত। রূপদমনের বয়ানে গল্পকথক বলেছেন —

> "সাহেব, মানুষে মানুষে ভালোবাসা হয়, কিন্তু বাঘের মতো এমন ভালোবাসতে কেউ পারে না। কুকুরের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা হয়, সে অন্যরকম, সেখানে মানুষ প্রভু, কুকুর তার অধীন। এখানে কিন্তু তা নয়, মানুষ আর বাঘ সমান সমান, কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।"[৭]

রূপদমনের সঙ্গে বাঘিনীর তিন বছরের এই সম্পর্কে কাঁটা হয়ে আসে রূপদমনের নতুন স্ত্রী। রূপদমনের বিয়ের পরই বাঘিনীর চরিত্রে বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়। বাঘিনীর হিংস্র রূপ প্রকাশ পায়। হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে বাঘিনী বরযাত্রী দলের সামনে দাঁড়ায়। যেন এখনই রূপদমনকে মেরে ফেলবে। কিন্তু গ্রামবাসীদের তৎপরতায় রূপদমন বেঁচে যায়। অতঃপর বাঘিনী রূপদমনের এই গ্রামটিকে লক্ষ করে ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে মেয়েদের উপরই আক্রমণ করতে শুরু করে। বাঘিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে রূপদমনের গ্রামের মানুষজন। হয়তো রূপদমনের নতুন স্ত্রীই ছিল বাঘিনীর একমাত্র লক্ষ্য বস্তু। কিন্তু গল্পকথকের বুলেটের আঘাতে বাঘিনীর সেই হিংস্রতার, তার তীব্র ভালোবাসার চিরসমাপ্তি ঘটে যায়।

গল্পটির পাঠে নরসমাজ থেকে দূরে একান্ত বিজনে, জঙ্গল ও পাহাড়ের আদিম বাতাবরণের মধ্যে রূপদমনের সঙ্গে এক হিংস্র বাঘিনীর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখি – যা ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসার সম্পর্ক। তাদের এই সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের কারণে বাঘিনীর মধ্যে ভয়ানক ঈর্ষার জন্ম হয়।

ঠিক এই ধরণেরই একটি গল্প হল তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যভিচারিণী'। গল্পের শুরুতে দেখা যায় এক পদ্মগোখরোর সঙ্গে লখীন্দর নামক বেদের প্রেমালাপের প্রসঙ্গ। লখীন্দর হল সাপের মাস্টার। এক বেদেনীর রক্ত তার শরীরে প্রবহমান। তার বাবা জেলে হলেও দলছুট এক বেদের মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল। মাছ ধরার পেশা ছেড়ে সে হয়ে উঠেছিল গুণিন। এ হেন বাবা মায়ের ছেলে লখীন্দর। কিন্তু লখীন্দর সাপের নজর ভালোভাবে চিনতে শিখেছে ভীমরাজ বেদের কাছে। এই বুড়োর কাছেই সাপের গতিবিধি, তাদের ঘর-সংসার সব ইতিহাস জেনে নিয়েছে লখীন্দর। তারপর একদিন ভীমরাজের ছেলে নগারির সঙ্গে লখীন্দরের বন্ধুত্ব হয়। মাঝে মাঝে নগারি আসত লখীন্দরের বাড়ি। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর সাতকাহন শোনাত নগারি। লখীন্দরের হাত ধরেই স্ত্রী গোলাপীর সাথে একদিন নগারির আলাপ হয়। সেই আলাপ থেকেই তাদের প্রেমের জন্ম হয় এবং অবশেষে তা ভালোবাসায় পরিণত হয়। অন্যদিকে ঠিক এই কারণেই বন্ধু নগারি লখীন্দরের শত্রুতে পরিণত হয়। কখন যে নগারি লখীন্দরের ভালোবাসার মানুষকে কামড় বসায় লখীন্দর তা টেরই পায়না। গল্পকথকের কথায় —

> "যখন লখীন্দরের জুড়িবুটি খেলা শেখা প্রায় শেষ, নতুনভাবে জীবন শুরু করার স্বপ্নে যখন মশগুল ঠিক তখনই একদিন বাড়ি ফিরে দেখল তার ঘর ফর্সা। বুড়ো ভীমরাজ বেদে তার তাঁবু গুটিয়ে দলবল নিয়ে যখন দেশান্তরে রওনা দিয়েছে, তখন গোলাপীও কোন ফাঁকে ভিড়ে গেছে নগারির সঙ্গে। ব্যাপারটা লখীন্দর জেনে একেবারে নিথর। ...সে বিড়বিড় করে শুধু বলেছিল, 'যা রে গোলাপী, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোলাপীর বেদেনী হয়ে চলে যাওয়ার পরেও লখীন্দর বিয়ে করার কথা ভাবে না। কিন্তু বোস-বাড়ির ফাটল থেকে পাওয়া পদ্মগোখরো তার সব চিন্তা-ভাবনাকে উলট-পালট করে দেয়। এই পদ্মগোখরোটি ছিল সাপিনী। লখীন্দরের নিঃসঙ্গ জীবনে সে তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠল। বেঁচে থাকার, গোলাপীকে ভুলে থাকার একমাত্র উপায় হয়ে উঠল এই একটি পদ্মগোখরো। গল্পটির পাঠে আমরা দেখি, এমনকি পদ্মের অমোঘ আকর্ষণে সারাদিন সম্মোহিত হয়ে থাকে লখীন্দর। লখীন্দর যতক্ষণ ঘরে থাকে পদ্মকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে —

> "কখনো পদ্মের ঠোঁটে চুমু খায়, পদ্মও তার চেরাজিব মেলে চেটে দেয় লখীন্দরের গাল। দেখলে মনে হয় ও তার বে করা বউ। পদ্মের পিচ্ছিল শরীরের স্পর্শে তার শরীর জেগে উঠে, এক অদ্ভুত সুখ তাকে অবশ করে দেয়।"[৯]

গোলাপীকে হারিয়ে লখীন্দরের যে ক্ষোভ, হতাশা হয়েছিল পদ্ম এসে তার অনেকটা মিটিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে পদ্মের উপর এমন ভাব-ভালোবাসা হয়ে উঠে যে পদ্মকে ছেড়ে লখীন্দর এক দণ্ডও থাকতে পারে না। পদ্মকে লখীন্দর কারো সঙ্গে ভাগ করতে চায় না। তাই গোপালনগরের ভবগোঁসাই পদ্মকে চুমু খেতে চাইলে লখীন্দর রেগে যায়। যে ভালোবাসা গোলাপীর থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সেই ভালোবাসার আশ্রয় হয়ে উঠেছে পদ্মগোখরো। তাই পদ্মকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে লখীন্দর বলে —

> "যা রে গোলাপী, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা, আমার পদ্ম তর চেয়ে ঢের ভালো, এ তর মতো বেইমানি করবে না।"[১০]

কিন্তু গল্পের মোড় বদলে যায় যখন লখীন্দর রূপনগরের পুজোর মণ্ডপ থেকে এক পুরুষ পদ্মগোখরোকে নিয়ে আসে। নতুন গোখরোকে দেখে পদ্মের ব্যবহার পাল্টে যায়। লখীন্দরের সঙ্গে আগের মতো আচরণ করে না। এক মাঝ রাতে লাইট জ্বালতেই লখীন্দর দেখতে পায় —

> "পদ্ম তার বিছানা থেকে নেমে নতুন ঝাঁপিটার চারপাশে ঘুরঘুর করছে, যার মধ্যে সদ্য ধরে আনা পদ্ম-গোখরোটা রাখা আছে।"[১১]

এই দৃশ্য দেখে লখীন্দরের বুক জ্বলে উঠে। মাথাটা গরম হয়ে যায় লখীন্দরের। কিন্তু পরক্ষণে পদ্ম, লখীন্দরের পায়ে সোহাগ জানালে লখীন্দরের রাগ আবার কমেও যায়। কিন্তু লখীন্দর স্থির থাকতে পারেনি। পুরুষ পদ্মগোখরোটিকে সরানোর ব্যবস্থা করে। শহরের এক বাবুর কাছে মোটা টাকায় মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাড়ি ফিরে লখীন্দর দেখে অন্য ছবি —

> "ঘরে ঢুকেই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তাতে তার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল শরীরের। ...ঘোরলাগা চোখে দেখল, মেঝের উপরে একজোড়া সাপ। প্রায় লেজের উপর ভর করে শঙ্খ ছড়াচ্ছে।"[১২]

দৃশ্যটা দেখে লখীন্দর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। তার বিছানা থেকে বের করে আনে একটা হাসুয়া। সেই হাসুয়া দিয়েই মুণ্ডচ্ছেদ করে দুটো সাপেরই। গোলাপী বেইমানি করে নগারির সঙ্গে চলে যায়। এমন দুঃসময়ে পদ্মই ছিল তার নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু শেষপর্যন্ত পদ্মও বেইমানি করে। শরীরের চাহিদার কারণে পদ্ম মিলিত হয় পুরুষ গোখরোর সঙ্গে। পদ্মের এই কাজকেই লখীন্দর স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। লখীন্দর হিংসার আগুনে জ্বলে হিংস্র হয়ে উঠে। গল্পের নিবিড় পাঠে গোলাপী ও পদ্ম এক হয়ে যায়। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বুননে ও রচনার কৌশলে পদ্মগোখরো এক নারীতে পরিণত হয়।

'ব্যভিচারিণী' শব্দের অর্থ হল অনৈতিকতাপূর্ণ আচরণকারী। গোলাপী, নগারির সঙ্গে চলে যাওয়ায় সে যেমন ব্যভিচারিণী আবার পদ্ম, পুরুষ গোখরোর সাথে মিলিত হওয়ায় সেও এক ব্যভিচারিণী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 61 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. বর্মণ ঝর্না, 'বিশ্লেষণে নির্বাচিত কাব্য-কবি ও কথাসাহিত্যিক', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৪, পৃ. ১৮৬
২. চট্টোপাধ্যায় সত্যচরণ, 'বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ', প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ২৬ শে জুন ১৯৯৮, ১১ আষাঢ়, ১৪০৫, পৃ. ১২৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, 'জলসাঘর', সুবর্ণরেখা, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ পৃ. ১৬২
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪
৫. পূর্বোক্ত
৬. গুপ্ত, শ্রী প্রতুলচন্দ্র (সম্পাদিত), 'শরদিন্দু অম্নিবাস', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, পৃ. ১৫৪
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৯
৮. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা- ২০০৩, পৃ. ১৩
৯. পূর্বোক্ত
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

Bibliography:

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা- ২০০৩
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জলসাঘর', সুবর্ণরেখা, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮
শ্রী প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, (সম্পাদিত), 'শরদিন্দু অম্নিবাস', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৩৬২
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯১২
শ্রী ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২
জীবেন্দ্র সিংহ রায়, 'কল্লোলের কাল', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০
Honore De Balzac, 'The Human Comedy', Peter Fenelon Collier, New York, 1893